# মড়িঘাটের মেলা

(গল্পগ্রন্থ – নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব)

আমাদের গ্রাম্য নদীর ধারে মড়িঘাটা বলে ছোট্ট একটা গ্রাম। ক'ঘর বুনোর বাস। এ জেলায় যখন নীলকুঠির আমল ছিল, দোর্দণ্ডপ্রতাপ নীলকুঠির সাহেবরা টমটম হাঁকিয়ে চলে যেত নদীর পাশের চওড়া ছায়াছন্ন পথ বেয়ে, তখন শ্রমিকের কাজ করবার জন্যে সাঁওতাল পরগণা থেকে যে সব লোক আমদানী করা হয়েছিল, তাদেরই বর্তমান বংশধরগণ এখন একেবারে ভাষায় ধর্মে আচারে ব্যবহারে সম্পূর্ণ বাঙালি হয়ে পড়েচে— এদেশে তাদের বলল 'বুনো'। সমাজের নিম্নস্তরের শেষ ধাপে এদের স্থান। লোকের কাঠ কেটে, ধান মেড়ে, দিনমজুরি করে এরা জীবিকা নির্বাহ করে। সারাদিন খাটুনির পরে তাড়ি খায়। এই তাড়ি খাওয়ার জন্যেই এরা ঘৃণিত হয় পল্লীসমাজে। পল্লীগ্রামে হিন্দু বা মুসলমান চাষিমহলে মদ কেউ ছোঁয় না। ওটা ভদ্রলোকেদের একচেটে ব্যাপার।

মড়িঘাটা নদীপথে চার ক্রোশ আমাদের ঘাট থেকে।

সেবার মাঘীপূর্ণিমার দিন গঙ্গাস্নানের যাত্রীরা যাচ্ছে কেউ নবদ্বীপে কেউ গৌরনগরের ঘাটে। উভয় স্থানই বহু দূর আমাদের গ্রাম থেকে। যাদের নিজেদের গরুর গাড়ি আছে, তারা আগের রাত্রে গাড়ি চড়ে চলে গিয়েছে আঠারো-উনিশ মাইল দূরবর্তী গৌরনগরের গঙ্গাতীরের দিকে। অপেক্ষাকৃত সাহসী ও চালাকচতুর যাত্রীরা যাবে ট্রেনে উঠে নবদ্বীপ।

রাধা দুধ দিতে এসে বললে— বাবু, গঙ্গাচানে গ্যালেন না?

—যে ভিড়! মেয়েদের নিয়ে অতদূরে যাওয়া

—তবে মড়িঘাটা যান বাবু নৌকা করে। কত লোক যাচ্ছে।

—সেখানে গঙ্গা কোথায়? মড়িঘাটায় গিয়ে কি হবে?

—না বাবু, সেখানে আজ গঙ্গা আসেন।

—কে বললে?

—সেখানে এক বুনো সাধু আছে, তাকে মা স্বপ্ন দিয়েলেন। আজ দুবার হল মাঘীপূর্ণিমের দিন গঙ্গা সেখানে আসবেন। মা বললেন, গরিব দুঃখী লোক, যারা নবদ্বীপে বা গৌরনগরে পয়সা খরচ করে যেতি পারে না— তাদের উদ্ধার করবার জন্যি ঐ মড়িঘাটাতে তিনি আসবেন একদিনের জন্যি। সব গরিব দুঃখী লোক সেখানে যায় আজ দু'বছর ধরে। মস্ত মেলা বসে। যান না আপনি।

কথাটা লাগলো ভালো। গঙ্গাস্নানে উদ্ধার হবার বাসনা যত থাক না থাক, অনেক লোক যেখানে এসে জোটে পুণ্য অর্জনের আশায়, সে স্থানের অসাধারণত্ব অনস্বীকার্য।

অক্রুর মাঝির নৌকো ভাড়া করে সবাই মিলে রওনা হই মড়িঘাটার দিকে। আমাদের পাড়ার অনেক ছেলেমেয়ে আমাদের সঙ্গে চলেচে মেলা দেখতে। যেখানে মাঠে কুল পেকেচে সেখানেই তারা নৌকা লাগাবে ডাঙায়, হৈ-হৈ করে কুল পাড়তে ছুটবে, ছোলাক্ষেতে ঘুঘু মারবার চেষ্টা করবে গুলতি ছুঁড়ে, ছোলার ফল তুলবে। প্রথম বসন্তে মাঠে মাঠে ঘেঁটুফুল, বড় বড় শিমুল গাছে শিমুল ফুলের মেলা, কোকিল ডাকচে, জলপিপি চরচে শেওলার দামে, বাতাসে ঘেঁটুফুলের তেতো গন্ধ আর শুকনো কশাড়ঝোপের গন্ধ ভেসে আসচে।

মড়িঘাটা পৌছুতে বেলা বারোটা বেজে গেল।

দূর থেকে একটা কোলাহল কানে গেল। বহুলোকের সমাগম হয়েছে বটে। আমাদের নৌকো ভিড়লো একটা প্রাচীন বটবৃক্ষের ছায়ায়। সেখানে আমাদের মতো অমন কত নৌকো ভিড়েচে। বটতলায় কত লোক রান্না করে খাচ্ছে। মেয়েদের ভিড় বটতলার ওপাশের ঘাটে— সেখানে সবাই স্নান করচে, গঙ্গা নাকি মাত্র সেই জায়গাটুকুতেই আসবার অঙ্গীকার করেছিলেন সেই বুনো সাধুর কাছে। সুতরাং সেখানেই ভিড় করেচে স্নানার্থীরা, তার এক হাত এদিকেও নয়, এক ফুট ওদিকেও নয়।

অক্রুর মাঝি বললে- মেয়েদের নিয়ে এপারের ভিড়ে কষ্ট হবে। চলুন ওপারে। ওপারে সেই বুনো সাধুর আখড়া। আপনি গেলি জায়গা দেবে। ওই দেখা যাচ্চে তেনার আখড়া। ওপারে রান্না করে খাওয়ার জায়গা হবে'খন। নইলে এপারে কনে বা কাঠ কনে বা উনুন—

মেয়েরা বললেন, আগে তাঁরা মেলা বেড়িয়ে দেখবেন।

মেলা বেড়াতে গেলেন মেয়েরা। আমিও সঙ্গে আছি। তেলেভাজা বেগুনি ফুলুরির দোকান, খেলনার দোকান, ঘুনসি ফিতে চিরুনির দোকান, চায়ের দোকান। ভিড় বেশি লেগেছে তেলেভাজা খাবারের দোকানে আর তার চেয়েও ভিড় চায়ের দোকানে।

পাড়াগাঁয়ে চায়ের দোকানে ভিড় বেশি হয়। এখানে যারা এসেচে, এদের মধ্যে চা অনেকেই বাপের জন্মে খায়নি। শৌখিন জিনিস হিসেবে অনেকেই এক পেয়ালা কিনে চেখে দেখচে। বুনো, কাওরা, মালো, ডোম, বাগদি, মুসলমানদের ভিড় বেশি এ সব মেলায়। হ্যাঁ, মুসলমানদেরও। তাদের মেয়েদের উৎসাহ কোনো অংশে কম নয়। 'গঙ্গা'স্নান তারা অবিশ্যি করে না, কিন্তু মেলা দেখতে আসে ও জিনিসপত্তর কেনে।

চায়ের দোকানের ভিড়ের মধ্যে দেখি মা অনিচ্ছুক ছোট ছেলের মুখের কাছে চায়ের ভাঁড় ধরে বলচে—খেয়ে নে, অমন করবি তো—এরে বলে চা—ভারি মিষ্টি—দ্যাখো খেয়ে—ওষুধ—জ্বর আর হবে না—আ মোলো যা ছেলে! চার পয়সা দিয়ে কিনে এখন আমি ফেলে দেবো কনে? মুই তো দু ভাঁড় খ্যালাম দেখলিনে? খা—

সরলা পল্লীবধূদের ঠকিয়ে মহকুমা শহরের ঘুঘু দোকানদার অবিনাশ মোড়ল মনিহারি জিনিস বিক্রি করচে।

—এরে বলে 'সোহাগী' সাবান। গরম জল করে মেখে দ্যাখো না নিয়ে গিয়ে। ভুরভুর করবে গায়ে গন্ধ। চুলকুনি সেরে যাবে ছেলেদের। সাড়ে ন'আনা দাম, তা তোমাদের কাছে আলাদা কথা, দুটো পয়সা কম দিয়ো। দাও পয়সা—বাবু যে! ভালো আছেন? মাদের এনেচেন বুঝি? বেশ বেশ। প্রাতোপেন্নাম। একটা সিগারেট খান—আসুন— আচ্ছা, পেন্নাম হই— আসবেন তাহলে এর পর দয়া করে। রান্নাবান্না করবেন ওপারে? সেই ভালো—এপারে সত্তিক জাতের ভিড়—

কিন্তু কি চমৎকার লাগে এদের আমোদ, উৎসাহ, ফুর্তি। বছরে একদিন মেলা, এমন উৎসব আসে ওদের জীবনে। আর সব দিন এরা বেগুন পোঁতে, ধান মাড়ে, কলাই মাড়ে, হলুদ শুকোয়। আজ এসেচে ছেলেমেয়ের হাত ধরে মেলা বেড়াতে। খাবে না চা, কিনবে না 'সোহাগী'সাবান?

নদীর ধারে লোকেরা রেঁধে খাচ্ছে। সবাই কিনচে নূতন হাঁড়ি, মাছ ও আলু। আমার বেশি ভালো লাগে দেখতে লোকে কি খায়? বেশির ভাগ লোকে রেঁধেছে মাছের ঝোল আর ভাত। আলু ও বেগুন কুটে দিচ্চে ঝোলে। আলুভাতে, বেগুনভাতে, মাখচে নুনতেল দিয়ে, যাদের ভাত হয়ে গিয়েচে। কপি বিক্রি হচ্চে চড়া দামে। এ অঞ্চলে কপির চাষ নেই, ওটা শৌখিন শহুরে আনাজ বলে গণ্য। কপি সবাই কেনেনি, যারা কিনেচে তারা অনেকে রেখে দিয়েচে বাড়ি নিয়ে গিয়ে পাঁচজনকে দেখিয়ে খাবে। খুব গরিব যারা তারা রাঁধচে শুধু আলু বা মানকচু ভাতে ভাত। একটি মা ও ছেলে একটা আঙট কলার পাতে একত্রে খেতে বসেচে, মোটা লাল আউশ চালের ভাত একরাশ, তার সঙ্গে ছোট্ট এতটুকু আলুভাতে। তার পাশেই একদল বড় বড় কইমাছ ভাজচে দেখে ছোট ছেলেটা বলচে- দ্যাখ মা কত বড় মাছ? কইমাছ খাবো মা—

—চুপ কর। ওদিকে তাকাতে নেই— খেয়ে নাও—নংকা খাবি? নংকা মেখে দেবো?

একজন কুলের অম্বল সাঁতলাচ্ছে ওপাশে।

আমাদের বেলা হয়ে যাচ্চে। মাছও কিনতাম, কিন্তু মাঝি বলে দিয়েছিল সাধুর আখড়াতে মাছ রান্না চলবে না। নৌকো নদী পার হল। ওপারে মাঠের মধ্যে ঠিক নদীর ধারে সাধুর আশ্রম, পাঁচ-ছ খানি খড়ের ঘর, নিচু ঢালা, ছোট নীচু দাওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নিকোনো-পুঁছোনো ঘরগুলি। গোবর দিয়ে লেপা চওড়া উঠোন।

উঠোনের মাঝখানে বাতাবিলেবু গাছে থোকা থোকা সাদা ফুল ও কুঁড়ি, মনমাতানো ভুরভুরে তীব্র গন্ধ দুপুরের বাতাসে।

অনেক যাত্রী আশ্রয় নিয়েচে ঘরের দাওয়ায়, বাতাবিলেবুতলার ছায়ায়। এরা কিন্তু রাঁধচে না। আখড়ায় আজ মচ্ছব, বড় বড় হাঁড়িতে খিচুড়ি রান্না হচ্চে, সাধুর শিষ্যবর্গ মচ্ছবের প্রসাদ খাবে। আমাদের মাঝি গিয়ে আমাদের কথা বলতেই সাধু বেরিয়ে এল। বিনীতভাবে হাত দুটি জোড় করে বললে—আসুন বাবাঠাকুর। বামুনের পায়ের ধুলো পড়লো। বড্ড ভাগ্যি আমার।

বললাম—আপনার আখড়াটি বেশ ভালো দেখছি।

—আপনাদের দয়া।

আঙুল ঊর্ধ্বদিকে তুলে বললে— আর তেনার দয়া। সে জনার দয়া। তা একটা কথা হচ্চে, এসেছেন যখন দয়া করে তখন রান্নাবান্নার জোগাড় করে দিই। মা ঠাকরুন তো আছেন—

বললাম— অন্য কোনো যোগাড়ের দরকার নেই। সব আছে আমার সঙ্গে। আপনি শুধু রান্না করবার একটা স্থান দেখিয়ে দিন আর উনুন খুঁড়বার জন্য দয়া করে একখানা শাবল যদি থাকে তো পাঠিয়ে দিন। মাঝি উনুন খুঁড়ে দেবে এখন। ঐ মাঠে শুকনো কাঠ পাওয়া যাবে না?

সাধু হেসে বললে— ওর জন্যি কিছু ভাববেন না। পুব পোতার ঘরখানা নিকোনো-পুঁছোনো আছে, ওর দাওয়ায় নতুন উনুন পাতা আছে। কেউ রাঁধেনি সে উনুনে। কিন্তু একটা কথা বাবু—

—কি?

হাত জোড় করে বললে— চাল ডাল আমি দেবো—

—না না, কেন আপনি দেবেন? আমাদের সঙ্গে সব আছে। আমাদের শুধু একটু জায়গা দেখিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে।

সাধু দুঃখিত হল বুঝলাম ওর মুখ দেখে, কিন্তু আর কিছু বললে না।

একটু পরে আমরা দলবলসুদ্ধ গাছের ধারের ঘরখানা দখল করে নিজেদের জিনিসপত্তর সেখানে আনিয়ে নিলাম নৌকো থেকে। সাধু নিজে এসে দুখানা নতুন মাদুর বিছিয়ে দিয়ে গেল দাওয়ায়, বললে—মাঠাকরুনদের জন্যে একখানা মাদুর ঘরের মধ্যে দেবো এনে?

—না, আমাদের সঙ্গে শতরঞ্জি রয়েচে।

সাধু ডাকলে— হরিদাসী, ও হরিদাসী— ইদিকে শুনে যাও—এনাদের জল তুলে এনে দাও—

একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের সুন্দর বৌ আধঘোমটা দিয়ে এসে দাওয়ার নিচে দাঁড়িয়ে বললে—কি বাবা?

—এনাদের এখানে থাকো। যা লাগে এনে দাও। তেঁতুলতলা থেকে চ্যালা করা শুকনো বড়ার কাঠ যত লাগে এনে দাও—মাঠাকরুনকে শুধোও কি লাগবে।

বৌটি হাসিমুখে দাওয়ায় উঠে এসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করলে। তারপর ছুটলো কাঠ আর জল আনতে। বারবার ছুটোছুটি করে সে এটা ওটা আনতে লাগলো, কেননা, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, অনেক জিনিসই আমাদের আনা হয়নি বাড়ি থেকে—যেমন, হাতা আনতে ভুল হয়েচে, জল রাখবার বালতি বা ঘড়া নেই, ডাল ঢালবার পাত্র নেই, শুকনো লঙ্কা খুঁজে পাওয়া গেল না মশলার পুঁটলিতে ইত্যাদি। আমার স্ত্রী অপ্রতিভ মুখে আমার দিকে চেয়ে আমার ঘাড়ে দোষটা চাপিয়ে দেবার চেষ্টায় বললেন—বাবাঃ যে তাড়াতাড়ি তোমার—ওতে কি সুশ্রুম্‌খুলে সব জিনিস গোছানো যায়? অত হড়বড়ানিতে মাথা গুলিয়ে যায় না?

আমি নির্বিকারভাবে অন্যদিকে চেয়ে থাকি।

ইতিমধ্যে সাধুবাবাজি একটা বড় আড়াইসের পালি ভর্তি মুড়কি এবং একছড়া সুপক্ক মর্তমান কলা নিয়ে এসে বললে— বাবু, সেবা করুন—

—এ সব আবার কেন?

—কেন বাবু, আমরা এতই অধম জাত যে আমাদের কোনো জিনিস নেবেন না?

—নিচ্চি তো। জল নিচ্চি, কাঠ নিচ্চি, বাসন-কোসন নিচ্চি— তা হলে কি নিলাম না বলুন? খাবারদাবার কেন আবার—

—তা হোক। আমার আখড়ায় আপনাদের মতো লোক কখনো আসেনি। আমি জেতে বুনো। ভেক নিয়ে বোষ্টম হইচি। তেনার দয়া। কি বুঝি বলুন? আমার নাম ছিল রামনাল বুনো। আমার বাপের নাম ছিহরি বুনো। তিনি তবলদার ছিলেন। ভদ্দরনোকের বাড়ি কাঠ কেটে সংসার নির্বাহ করতেন। তেনার বয়েস হয়েছিল অনেক, এক কম একশো বছরে মারা যায়। আমার বয়েস কত বলুন দিকি বাবু?

সাধুর চেহারা বেশ ভালো লেগেছিলো আমার। খুব মোটা, জোয়ান লম্বা চেহারা। প্রকাণ্ড ভুঁড়ি— অথচ অথর্ব গোছের মোটা নয়, বেশ বলিষ্ঠ, কর্মকুশল হাত পা। লম্বা ধরনের খুব বড় মুখখানা, মস্ত বড় বড় জ্বলজ্বলে চোখ দুটো, নারদ ঋষির মতো এতখানি সাদা দাড়ি। মাথার লম্বা চুল পেছন দিকে মেয়েদের মতো ঝুঁটি করে বাঁধা, অথচ মুখখানিতে বালকের সারল্য ও হাসি। যাত্রাদলের মহাদেবের মতো দেখতে।

বললাম—কত হবে, ষাট-বাষট্টি ?

সাধু হেসে বললে—বিশ্বাস করবেন না। উনআশি বছর যাচ্চে তেনার দয়ায়—

সত্যিই আশ্চর্য হবার কথা। এমন মর্দ জোয়ান পুরুষটিকে আশি বছরের বুড়ো কোনো ক্রমেই ভাবা যায় না। মুখের চামড়া মসৃণ, অকুঞ্চিত, বালকের মতো। একটি রেখা নেই কোথাও মুখে। অবশ্যি সেটা খানিকটা সম্ভব হয়েচে মেদবাহুল্যের দরুন। অবাক হয়ে সাধুর দিকে আমি চেয়ে রইলাম।

—বাবু, বিশ্বাস না হয় অম্বরপুরের কাছারির পুরনো কাগজ দ্যাখবেন। ১৩০১ সালের বন্যের সময় আমি কাছারিতে পেয়াদা ছিলাম। তখন আমার উঠতি বয়েস। নাঠি ধরতে পারি। সড়কি ধরতে পারি।

—তারপর?

—তারপর এ পথে আলাম। তেনার হুকুম হল। তা অনেকদিন ভেক নিইচি, আজ ছত্রিশ-আটত্রিশ বছর হবে। বিয়েথাওয়া করিনি, এই আখড়া যেখানে দ্যাখচেন, এখানে জঙ্গল ছেল, কি গহিন জঙ্গল। বাঘ থাকতো। জঙ্গল কেটে আখড়া জমাই।

—ভালো লাগে?

—বড্ড আনন্দে থাকি বাবু। শিষ্যিসেবকরা আসে, সন্দেবেলা জ্যোচ্ছনা ওঠে। গাঙের ধারের বড় ঘরখানা হল ঠাকুরঘর। ওর দাওয়ায় বসে খোলকত্তাল বাজিয়ে হরিনাম করি। একটা কথা বাবু, পথচলতি লোক আমার আখড়ায় এলি ফিরতি পারে না। চাল দেই, ডাল দেই, —রেঁধে খাও, আমি ছোট জাত, আমাদের হাতে খাবা না! রান্নাবাড়া করো, খাও, মিটে গেল। মানুষের এট্টু সেবা, তা করবার ভাগ্যি কি আমার হবে? তেনার দয়া। বাবু, তামাক সেবা করেন?

—হ্যাঁ, তবে আমার কাছে বিড়ি আছে।

—তামুক সেজে আনি, বসুন।

নদীর ধারে ক্রমে বেলা পড়লো। সাধুর আশ্রমে ভিড় বেড়ে গেল খুব। মচ্ছবের কীর্তন শুরু হল বাতাবিলেবুর তলায়। সাধু সবদিক তদারক করে বেড়ায় আর মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে বসে। কিন্তু একদণ্ড সুস্থির হয়ে বসতে পায় না। এ এসে বলে, একটা ঘড়া দাও, ও এসে বলে, একটা ঘটি দাও। সাধু উঠে উঠে গিয়ে তাদের জিনিস দিয়ে আসচে। যে যা হুকুম করছে, তখুনি তামিল করচে। এতটুকু অহঙ্কার নেই, সাধুগিরির দম্ভ নেই, যেন সবারই ও চাকর। অনেক লোক আখড়ার বড় উঠানে ইতস্তত রেঁধে খাচ্চে। সবাই মচ্ছবের ভাত খাবে না বুঝলাম।

একবার হরিদাসী এসে বললে- বাবা, নামযজ্ঞ শেষ হয়েছে, কিছু মুখে দেন এবার। সকাল থেকে খাননি। সাধু বললে— আগে ওদের সকলকে পাতা করে বসিয়ে দাও। আমার খাওয়ার জন্যি ব্যস্ত কেন?

তখন বেলা পাঁচটা হবে। আশ্চর্য হয়ে বললাম— সকাল থেকে কিছু খাননি?

হরিদাসী বললে—বাবার ওই রকম। সন্দের আগে একবার খান। অন্যদিন সকালে পেঁপে খান, কলা খান, আজ তাও খাননি। আপনি কিছু না মুখে দিলে আমি খেতে বসবো না বাবা।

সাধু হেসে বললে— আচ্ছা যা মা। একটু গুড়জল নিয়ে আয়। মালসা ভোগ নিবেদন হয়েচে? যা, বাবুদের জন্যি একটা ভালো দেখে মালসা নিয়ে আয় দিকি আগে। দুখানা পাটালি বেশি করে দিয়ে আনিস। বাবুদের মালসা ভোগ খেতে কোনো আপত্তি নেই তো?

—না, আপত্তি কিসের?

হরিদাসী চলে গেল এবং খানিক পরে একটা মালসা ভোগ আমাদের সামনে নিয়ে এসে রাখলে। রান্না হচ্ছিল পাশের ঢেঁকিশালের এক কোণে। হরিদাসী সেদিকে তাকিয়ে বলে উঠলো—বাবু আপনাদের রান্না নেমে গিয়েচে। কলার পাতা কেটে আনি, জায়গা করে দিই—খেতে বসুন, বেলা নেই।—সে আবার চলে গেল।

জিগ্যেস করলাম—বৌটি কে?

—ওরা গোয়ালী। কাছেই কামদেবপুরে বাড়ি। আমাকে বড্ড ভক্তি করে। একেবারে যেন আর-জন্মের মেয়ে কি মা। ওরা স্বামী-স্ত্রী আমাদের এখানে মচ্ছবের অন্নভোগ খায়। অনেকে খায়।

আমাদের খাওয়ার সময় সাধু কতবার যে এল গেল, হাতজোড় করে ঢেঁকিশালের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। খাওয়ার শেষে যখন হরিদাসী বড় একবাটি জ্বাল দেওয়া দুধ হাতে ঢুকলো, তখন আমরা প্রতিবাদ জানালাম। দুধ কেন আবার? হরিদাসী জানালে এ দুধ তার নিজের হাতে জ্বাল দেওয়া, খেতে কোনো আপত্তি হবার কারণ নেই।

সাধু বললে- সেবা করুন বাবু। আমি ওরে বলেছিলাম বাবুদের জন্যে দেড়সের দুধ আলাদা করে ক্ষীরের মতো জ্বাল দ্যাও। ওঁদের খাওয়ার কষ্ট হবে।

আহারাদির পর বেলা একেবারে গেল। অম্বরপুরের মাঠের বন্য কুলগাছগুলোর পেছনে টকটকে রাঙা সূর্যটা অস্ত যাচ্চে। লেবুফুলের সুবাস ছায়াস্নিগ্ধ বাতাসকে মদির করে তুলেচে। শুকনো কশাড়ঝোপের গন্ধ আসচে গাঙের ধার থেকে। মেলা-ফেরত যাত্রীরা আখড়ার সামনে গরুরগাড়িতে উঠে নিজের নিজের গ্রামে রওনা হচ্চে। খেয়াঘাটে একখানা যাত্রীবোঝাই নৌকো এপারের দিকে আসচে। মেলা থেকে যারা বাড়ি ফিরচে তাদের কারো হাতে তেলেভাজা পাঁপড়ের গোছা, কারো হাতে একটা কপি, কারো হাতে নতুন বঁটি।

মাঝি আবার ওপারে গেল মেয়েদের নিয়ে। যাবার আগে অপরাহ্নের ছায়ায় আর একবার মেলা দেখতে চায় মেয়েরা। আমি গেলাম না। সাধুর সঙ্গে বসে গল্প করছি দেখে স্ত্রীও কিছু বললেন না।

সাধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—যাক, এ বছরের মতো মেলা শেষ হয়ে গেল। আবার যদি বাঁচি আসচে বছর, তখন আপনার সঙ্গে দেখা হবে। আসবেন তো বাবু?

কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। বললাম, একটা কথা, মড়িঘাটের এখানে গঙ্গা আসেন, কে নাকি স্বপ্ন দেখেছিল? আপনি নাকি?

সাধু গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে। কেমন এক অদ্ভুত ধরনের হাসি ওর দাড়ির জাল ভেদ করে ওর সারা মুখখানায় বিস্তারলাভ করলে। কি চমৎকার জ্ঞান ও কৌতুকমিশ্রিত হাসির ছবি, যেন অতি প্রবীণ জ্ঞানবৃদ্ধ ঠাকুরদাদা কৌতুক ও করুণার হাসি হাসচেন তাঁর অবোধ নাতিটির প্রশ্ন শুনে।

বললে—স্বপ্ন-টপ্ন নয়। এখানকার গরিব লোকে পয়সা খরচ করে গঙ্গায় নাইতে যেতে পারে না মাঘী পূর্ণিমায়। তাই রটিয়ে দিয়েছি মা গঙ্গা এই মড়িঘাটার গাঙে আসবেন বলেচেন আমার কাছে পূর্ণিমার যোগের দিন। মন শুদ্ধ করে নাইলে এখানেই গঙ্গা। তিনি নেই কোন্ জায়গায়।

সন্ধ্যা হবার আগেই সাধুর কাছে বিদায় নিয়ে যখন নৌকোয় উঠি তখন ওপারের সেই বটগাছটার পিছন থেকে মস্ত বড় চাঁদখানা উঠচে। এপারে চিকচিকে চখা-বালির ঘাটে হাতজোড় করে বুনো সাধুটি দাঁড়িয়ে বলচে—মা-ঠাকরুনকে নিয়ে আবার আসবেন বাবু সামনের বছর। —ভুলে যেয়ো না মা তোমার বুড়ো খোকাকে—দণ্ডবৎ হই মা—যদি বেঁচে থাকি, সামনের বছরে পায়ের ধুলো যেন পড়ে—।

দেখি আমার স্ত্রীর চোখে জল।